বেলাশেষে ও প্রাক্তনের সাফল্য এবং পুরুষতন্ত্রের ধ্বজা

উম্মে ফারহানা

> বিয়ে ও সংসার আজো নারীর জন্যে প্রধান পেশা হয়ে আছে, প্রতিক্রিয়াশীলতা যেভাবে প্রবল হচ্ছে তাতে অচিরেই তা আবার একমাত্র পেশা হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। সমাজ নারীকে আজো হ'তে বলে সুগৃহিণী ও সুমাতা, তার কাছে দাবি করে সতীত্ব ও পাতিব্রত্য। সমাজ পুরুষকে দেয় বাস্তব শর্ত, অর্থাৎ পুরুষের কাজ সংসার চালানো : নারীকে দেয় নৈতিক শর্ত, তাকে হতে হবে সুমাতা, সুগৃহিণী, সতী। নারীর সুমাতা, সুগৃহিণীত্বকে ঐশী ভাবাদর্শে পরিণত করা হয়েছে নারীকে পুরুষাধীন রাখার জন্যে।
>
> *হুমায়ুন আজাদ, নারী*[১]

ভিন্নদেশের চলচ্চিত্র কিংবা তাদের জনপ্রিয়তা নিয়ে চিন্তিত বা দুশ্চিন্তিত হবার কারণ ঘটে না যতক্ষণ না সেগুলো নিজদেশের দর্শককে বিরাট মাত্রায় প্রভাবিত করে। ভাষাটা বাংলা হবার কারণে চিরকালই কলকাতার ছায়াছবি বাংলাদেশে জনপ্রিয় ছিল। হালে বেলাশেষে[২] (২০১৫) এবং প্রাক্তন[৩] (২০১৬), একই পরিচালকজুটির (নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়) দুটি ছবি পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই, বাংলাদেশেও তুমুল জনপ্রিয়তা পেল। দুটি ছবিতে একটি ব্যাপার কমন, তা হলো বিবাহবিচ্ছেদ। হিন্দু পরিবারে তো বটেই, ভারত ও বাংলাদেশের মুসলমান পরিবারগুলোতেও তালাক কোনো সামান্য ঘটনা নয়। এমন স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে বানানো ছবিগুলোতে তালাক এবং তালাকপরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে নারীর অবস্থান চিত্রায়ণে যে বিপজ্জনক পুরুষতান্ত্রিকতার ব্যবহার লক্ষ করা গেল এবং চলচ্চিত্রদ্বয়ের জনপ্রিয়তা বা সাফল্যে এই পুরুষতান্ত্রিকতার ধ্বজা আরো কত উচ্চতায় উড্ডীয়মান হবার সম্ভাবনা দেখা দিলো, সেটিই এই লেখার মূল প্রতিপাদ্য।

কাহিনিসংক্ষেপ : বেলাশেষে

আরতি (স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত) ও বিশ্বনাথ মজুমদারের (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) ৪৯ বছরের বিবাহিত জীবনে সংকট নেমে আসে যখন তিনকন্যা ও একপুত্রের পিতা বিশ্বনাথ আরতিকে ডিভোর্স দিয়ে নিজের মতন বাঁচতে চান। তাঁর মনে হয় তাঁদের সম্পর্কে ভালোবাসা নেই, যা আছে সেটি হলো অভ্যাস; সংসারকে তিনি অনেক দিয়েছেন, আর কোনো দায়িত্ব তিনি পালন করতে চান না। সন্তানদের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে দেওয়া এই ঘোষণার আগে তিনি আরতির সঙ্গে এ ব্যাপারে কোনো আলাপ করে নেন নি। শুরুতে আরতি ব্যাপারটিকে হালকাভাবে নেন, ভাবেন ছেলেমেয়েদের পূজোয় বাড়ি আসা নিশ্চিত করতে স্বামীর এ এক অভিনব ফন্দি। আরতিকে তিনি বাড়ি লিখে দেবেন সেটাও জানান। মেয়েদের পরামর্শে একজন আইনজীবী নিযুক্ত হন। মামলা কোর্টে উঠলে বিচারক এই দম্পতিকে কিছুদিন একান্তে কাটিয়ে আসতে বলেন। আরতি ছেলেমেয়ে আর নাতিনাতনিদের না নিয়ে কোথাও বেড়াতে যেতে রাজি নন বলে সকলে মিলেই

[১] নারী, হুমায়ুন আজাদ, আগামী প্রকাশনী, ২০১২ পৃষ্ঠা ৩৬৩
[২] বেলাশেষে : https://www.youtube.com/watch?v=MVXNENC9NFg
[৩] প্রাক্তন : https://www.youtube.com/watch?v=owIwSk9tZkw

শান্তিনিকেতনের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া হয়। কলকাতার বাড়িতে এই দম্পতি এক ঘরে রাত্রিযাপন করতেন না। শান্তিনিকেতনে তাঁদের একান্তে সময় কাটাবার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ছুটি শেষে বিশ্বনাথের সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত থাকে। আলাদা হয়ে যাবার কিছুদিন পর বিশ্বনাথ আরতির কাছে ফিরে আসেন; জানান, বিকেলের চা খাবার সময় তাঁর খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগত, আরতিকে ছাড়া তাঁর দৈনন্দিন জীবন অসহনীয় হয়ে যাচ্ছিল। আরতি স্বামীর এই প্রত্যাবর্তনের আনন্দে না কি নিজেকে অপরিহার্য ভাবতে পারার গর্বে কেঁদে ফেলেন; জানান যে তিনি সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করেন যেন তিনি স্বামীর আগে মারা না যান, কারণ তাঁর স্বামী তাঁকে ছাড়া বেঁচে থাকতে অপারগ।

ছবির সাবপ্লটে দেখা গিয়েছে একপুত্র ও তিনকন্যার দাম্পত্যজীবনের খণ্ডচিত্র। বাবা-মায়ের পঞ্চাশতম বিবাহবার্ষিকীর সময় তাঁদের মধ্যকার ছোট-বড়ো সমস্যাগুলোও মিটে গেছে বলে মনে হলো।

সুগারকোটেড ভিক্টোরীয় পৃথক এলাকাতত্ত্ব এবং নাকের জল চোখের জল

হুমায়ুন আজাদ 'এঞ্জেল ইন দ্য হাউজ' ধারণাটির বাংলা করেছেন 'গৃহলক্ষ্মী', কোভেন্ট্রি প্যাটমোরের কবিতার শিরোনাম ছিল এটি। নারীকে ভিক্টোরীয়রা দুই ভাগে বিভক্ত করেছিলেন : হয় সে গৃহলক্ষ্মী নয়ত সে পতিতা, বেশ্যা, অসতী কিংবা ডাইনি। প্রথম শ্রেণিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নারী যে বিপুল শ্রম দিয়ে থাকেন গার্হস্থ্য এলাকায়, তাকে প্রায় স্বাভাবিক ধরে নেওয়া হচ্ছে বহু শতাব্দী ধরে। এর স্বীকৃতিও নেই সমাজে। পুরুষশাসিত সমাজ সামান্য কৃতজ্ঞতাও বোধ করে না নারীর মেধা, শরীর ও মনের এই অপচয়ে। এই গার্হস্থ্য দাসীত্বকে প্রেম বা ভালোবাসার সঙ্গে এক করে দেখবার সুযোগ নেই। কিন্তু এই চলচ্চিত্রে তাই করা হলো।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছবিটি সম্পর্কে ব্যাপক প্রশংসামূলক পোস্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। যাঁরা এই চলচ্চিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করছিলেন, তাঁরা কয়েকটি ব্যাপার একেবারেই লক্ষ করেন নি কিংবা এড়িয়ে গেছেন।

প্রথমত, ভিক্টোরীয় পৃথক এলাকাতত্ত্বের (ডিফরেন্ট স্ফিয়ার) আওতায় যে গৃহলক্ষ্মীর (এঞ্জেল ইন দ্য হাউজ) ধারণা সমাজে প্রচলিত ছিল, সেই পুরাতন ধারণাকেই একবিংশ শতকের সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা দেখা গেল এই ছবিতে। এই নারীবিদ্বেষী তেতো বড়ি এ যুগের দর্শককে গেলানোর জন্যে ব্যবহার করা হলো ভালোবাসা নামের সুগারকোট। যদিও বিকেলের চা খাবার অভ্যাসে কিংবা জুতো খুঁজে না পাওয়ার নির্ভরতায় বিবাহিত সঙ্গিনীকে অপরিহার্য ভাবাটা সেই নারীর প্রতি ভালোবাসার কতটা স্পষ্ট লক্ষণ বা আদৌ কোনো লক্ষণ কি না তা মোটেও বোধগম্য নয়।

বিশ্বনাথ ব্যবসার ভার ছেলের হাতে ন্যস্ত করে অনেকটা সময় অবসরে কাটাতে পারছিলেন, আরতির জীবনে কিন্তু অবসর বলে কিছু ছিল না। পুত্রবধূটি তাঁর বুটিকের জন্যে শাড়ি আনতে বেরিয়ে গেলে নাতিনাতনিদের খাওয়ানোর দায়িত্বও এই বর্ষীয়সী নারীর ওপরই পড়ে। উনি যাপন করছিলেন বিনা মাইনের এক গৃহকর্মিণীর জীবন। উনাকে সংসারের কর্ত্রী বললে সেটা হবে নিছক ভাঁওতাবাজি। অত সম্পন্ন সংসারে বিশ্বনাথ ব্যবহার করার পর বাথরুমের দুর্গন্ধ কাটাতে জল ঢালবার জন্য চাকরের অভাব হবার কথা নয়। কিন্তু আরতি নিজেই জানালেন স্বামীর বর্জ্যের সেই গন্ধও তাঁর ভালো লাগে! এই একনিষ্ঠ সেবা এবং প্রশ্নহীন শ্রদ্ধাই নারীর দিক থেকে ভালোবাসার প্রকাশ। গোপন ক্যামেরায় এহেন কর্তব্যনিষ্ঠ পতিপ্রেম দেখে

এদিকে এই দম্পতির ছেলেমেয়েরা (অনুমান করি দর্শকদের একাংশও) নাকের জল চোখের জল এক করে ফেললেন।

দ্বিতীয়ত, বিশ্বনাথকে কোনোক্রমেই অপরাধবোধ বা অনুশোচনায় আক্রান্ত হতে দেখা গেল না, এমনকি ফিরে আসবার সময়েও। জুনিয়র মজুমদার একদিন বাবাকে একা পেয়ে কেঁদেকেটে জানালেন পরিবারের ভাঙন নিয়ে নিজের শঙ্কা ও অসহায়ত্বের কথা। কিন্তু তাঁর পরম পূজনীয় পিতাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার মতন জোরালো ছিল না তাঁর স্বর। পিতৃতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা পাকাপোক্ত করার জন্যেই বিশ্বনাথকে অত উচ্চাসনে বসানো হলো।

একমাত্র মেজোমেয়ে মালশ্রীকেই (ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত) দেখা গিয়েছিল বাবার এহেন অন্যায় সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করতে। কিন্তু বাবা যখন সেই মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন যে তিনি তাঁর স্বামীর কতটা অনুগত, জোঁকের মুখে নুন পড়ার মতন চুপ করে যান মালশ্রী। সাবপ্লটে দেখানো হয়েছে মালশ্রীর পরকীয়া সম্পর্ক রয়েছে। যেহেতু দাম্পত্যের মূল শর্তই তিনি পূরণ করছেন না, একনিষ্ঠ থাকছেন না স্বামী বিজনের প্রতি, তাই বাবার অন্যায়ের প্রতিবাদ করা তাঁর সাজে না। বিজনের মতন একনিষ্ঠ স্বামীকে দেখানোর উদ্দেশ্যও সম্ভবত এটিই। স্বামীরা যে সবসময় স্ত্রীদের প্রতি উদাসীন নন, কোনো কোনো স্বামী যে স্ত্রীর পরপুরুষে আসক্তি জেনেও খাবার নিয়ে বসে থাকেন, তা দেখিয়ে পার্শ্বচরিত্র বিজনকে দিয়ে বিশ্বনাথের স্বেচ্ছাচারিতাকে খানিক ব্যালান্স করা হলো যেন।

কিন্তু যে সামাজিক অসম্মানের মধ্যে দিয়ে আরতি গেলেন, এমনকি তাঁদের সন্তানদেরও যেতে হলো, পুত্রবধূর বুটিকে এসে প্রতিবেশিনী কথা শুনিয়ে গেলেন, সেসবের জন্যে বিশ্বনাথকে কোনো শাস্তি পেতে হলো না।

সবশেষে ভিক্টোরীয় 'এঞ্জেল ইন দ্য হাউজ' তত্ত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই যেন ছবির উদ্দেশ্য ছিল এমনই মনে হলো। বিশ্বনাথ যখন আরতিকে স্বনির্ভর হবার কথা বলেন, তখন আরতি জানান, 'বাইরেটা তুমি সামলাবে, ভেতরটা আমি, তাই তো কথা ছিল'— ঘরে বাইরে (১৯৮৪) খ্যাত ধ্রুপদীজুটির মধ্যকার এক কথোপকথনে স্পষ্ট হয় প্রৌঢ় এই দম্পতির সংসারে এতদিন যে শান্তি বজায় ছিল তার মূল কথা এই ঘর আর বাহিরের বিভাজন।

কোনো কোনো দম্পতির দাম্পত্যে এমন স্পষ্ট শ্রমবিভাজন থাকতেই পারে যে, স্বামী রোজগার করবেন আর স্ত্রী সংসার সামলাবেন (কিংবা উলটোটা)। এমন বোঝাপড়া করে নিয়ে পরিবার ঠিকমতো চালাবার সিদ্ধান্ত এ যুগেও কোনো দম্পতি নিতেই পারেন, সেটি কোনো সমস্যা নয়। কিন্তু নিজের খেয়াল-খুশিমতো স্ত্রীকে ত্যাগ করা আবার ইচ্ছে হলেই পুনরায় গ্রহণ করার স্বাধীনত া যে স্বামীর থাকবার কথা নয়, আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন কোনো নারী যে শুধু ভালোবাসার নামে স্বামীর হাতের পুতুল হতে রাজি হবেন না, সে কথা বেমালুম ভুলে গেছেন এই ছবির নির্মাতারা।

কাহিনিসংক্ষেপ : প্রাক্তন

ট্রেনের কামরায় স্থপতি সুদীপার (ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত) পরিচয় হয় গৃহবধূ মল্লিকা (অপরাজিতা আঢ্য) ও তাঁর শিশুকন্যার সঙ্গে। কিছুক্ষণ আলাপের পরেই সুদীপা টের পান মল্লিকা তাঁর প্রাক্তন স্বামী উজানের

(প্রসেনজিত) বর্তমান স্ত্রী। অতি প্রগলভ মল্লিকাকে শুরুতে বিরক্তিকর মনে হলেও সুদীপা মানিয়ে নেন। ভাব করে নেন ছোট মেয়েটির সঙ্গে। ফ্ল্যাশব্যাকে সুদীপার প্রাক্তন স্বামী উজানের সঙ্গে থাকাকালীন জীবনের খণ্ডচিত্র সমান্তরালে দেখা যায়। সুদীপা দেরিতে অফিস থেকে ফিরলে বসের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের সন্দেহ, গর্ভকালীন সময়ে অনুপস্থিতি, একা বাবার বাড়িতে যেতে না দেওয়ার কর্তৃত্ব, সুদীপার আলাদা ফ্ল্যাটের স্বপ্নকে উড়িয়ে দেওয়া— এসবের মধ্যে দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক উজানের চরিত্র উন্মোচিত হয়।

মল্লিকা সেই উজানের সঙ্গে এত সুখে আছে কীভাবে সেটা ভেবে বিস্মিত হবার সুযোগ নেই। কেননা মল্লিকা চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন, স্বামীর অতীত নিয়ে মাথা ঘামান নি, নিজের ভেঙে যাওয়া প্রেমের কথা ভেবে ব্যাচেলরের বদলে ডিভোর্সড পুরুষকে বিয়ে করেছেন স্বেচ্ছায়। তিনি শ্বশুরবাড়িকে নিজের বাড়ি বলেই ভাবেন, নিজের কেরিয়ার জলাঞ্জলি দিয়েছেন, স্বামীর ট্র্যাভেল এজেন্সির ব্যবসাই তাঁর ধ্যানজ্ঞান। মোটকথা বশংবদ স্ত্রী হওয়া বাদে তাঁর নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব নেই।

ভিক্টোরীয় সহচরী তত্ত্বের ইউফেমিজম : অ্যাডজাস্টমেন্ট

উজানকে হারাবার বেদনা প্রবল হয়ে উঠতেই পারে সুদীপার। ছবি শেষে দেখা যায় সুদীপাও আবার বিয়ে করেছেন। বর্তমান স্বামী তাঁকে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা বেড়িয়ে আনলেও উজানের সঙ্গে বেড়াতে যেতে না পারার অপ্রাপ্তি তাঁকে বিষণ্ন করে তুলতেই পারে। রাগ, ঘৃণা, হিংসার মতন অনুশোচনাও স্বাভাবিক মানবিক অনুভূতি, সেটা নিয়ে বলার কিছু নেই। সুদীপাকে বর্তমান স্বামীর সঙ্গে সুখে থাকতে দেখে উজানের মনেও হারানো দিনের স্মৃতি জেগে উঠতে পারত। মানবিক অনুভূতিগুলো কোনো যুক্তির ধার ধারে না কোনোকালেই।

কিন্তু আপত্তিকর এটাই যে উজানের সঙ্গে সুখী হতে না পারা সুদীপা যখন মল্লিকাকে জানান যে উনি মল্লিকার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখলেন, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না এ ছবির বটমলাইন হলো, 'অ্যাডজাস্টমেন্ট মানে হেরে যাওয়া নয়, অ্যাডজাস্টমেন্ট মানে হলো সুন্দর করে বাঁচা'।

এই বাণী যে মেসেজ দেয় তা হলো, একজন নারী যত মেধাবীই হোন (স্থপতি হোন বা রকেট সায়েন্টিস্ট), আত্মসম্মানবোধ তাঁর থাকতে নেই। নিজের উপার্জনের টাকায় স্বামীকে নিয়ে বেড়াতে যাবার প্ল্যান না করে বরং কয়েকবছর অপেক্ষা করে স্বামীর উপার্জনে বেড়াতে যাওয়া উচিত, অফিসে কাজের চাপ বেশি হলে চাকরি ছেড়ে দেওয়াই ভালো যাতে স্বামী বসকে নিয়ে কূটসন্দেহ না করতে পারেন, নিজেদের একান্তে সময় কাটাবার প্ল্যান বাতিল করে বন্ধুর মায়ের সৎকারে ব্যস্ত হয়ে পড়লে স্বামীকে দোষ না দিয়ে ধৈর্য ধরা উচিত। শ্বশুরবাড়িকে 'পকেটে' রাখার টোটকা মুখস্থ করা দরকার, নিজের আলাদা ফ্ল্যাটের স্বপ্ন কোনোদিনই দেখা সমীচীন নয়। নিজের জীবনের এই ইগোসংক্রান্ত 'ভুল'গুলো (ছেলেমানুষী, জেদ) নিয়ে অনুতপ্ত সুদীপা তাঁর বর্তমান সংসারে মল্লিকার মহান বাণী প্রয়োগ করেন কি না তা অবশ্য ছবিতে দেখা যায় না।

নারীর আলাদা অস্তিত্ব অস্বীকার করে তাকে পুরুষের যোগ্য সহচরী হয়ে ওঠার মতন যোগ্যতা অর্জনের প্রেসক্রিপশন ভিক্টোরিয়ান আমলের দেওয়া। এটি এই সময়ে আবার দিয়ে তালাকের মতন দুর্যোগ ঠেকাবার উপায় হিসেবে বাতলে দেবার কাজটি সফলভাবে করতে পেরেছে এই চলচ্চিত্রটি।

উজানের অপরাধ লঘু করার জন্যে তাঁকে দেখানো হয় সুদীপার কাজের পেপার কাটিং জমাতে। মল্লিকার বাড়ি থেকে যৌতুক না চাওয়াও উজানকে উদার ও ভালোমানুষ হিসেবে উপস্থাপন করার জন্যেই। ঘুমন্ত সুদীপার মাথার কাছে শুভেচ্ছাবাণী রেখে যাওয়া উজান বেশ ভালো আছেন একথা বোঝাই যায়। চলাফেরা সাজপোশাকে আধুনিকা স্বনির্ভর স্ত্রীর বদলে স্থূলকায় গিন্নি ধরনের বউ তাঁকে বেশ স্যুট করেছে, কেন করেছে তাও সহজবোধ্য। তাঁর মেল শভিনিস্ট ইগোতে আঘাত লাগবার মতন কোনো কিছুই মল্লিকা করেন না। 'অ্যাডজাস্টমেন্ট' বলতে মল্লিকা যা বোঝান তা আসলে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে সমঝোতা নয়, স্বামী নামক পুরুষের পুরুষতান্ত্রিক দাপটের সঙ্গে মানিয়ে চলার নাম।

আশঙ্কা বা দুর্ভাবনার হেতু

দুটি ছবিই কলকাতায় নির্মিত, বাংলা ভাষার ছবি হলেও বাংলাদেশের নয়। তাহলে ছবিগুলোর বক্তব্য আমাকে ভাবিত করছে কেন? শুরুতেই বলেছি, ছবি দুটি ব্যবসাসফল; আর কিছু নয়, ছবি দুটোর জনপ্রিয়তাই আমার দুর্ভাবনার কারণ। যে নারীবিদ্বেষী মেসেজ এই ছবিগুলো দিচ্ছে, তা শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে জনপ্রিয় হয়ে গেলেও দুশ্চিন্তার কারণ আছে বৈকি।

দর্শক যখন ছবির অভিনয়, সংলাপ, নির্মাণশৈলী, গল্পবলার ঢং বা সংগীত দ্বারা মুগ্ধ হয়ে ছবির মূল গল্পটা গলাধঃকরণ করে নেবার সময় গল্পের আড়ালে থাকা সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র টের পান না, তখন বুঝতে হবে হয় এই বিরাট সংখ্যক দর্শক আসলে মেধাহীন এবং বিনোদনের নামে ছাইপাঁশ গিলতে তাঁদের আপত্তি নেই, নয়ত আমরা চিন্তায় ও দর্শনে পিছিয়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশের অনেক দর্শকের কাছে কলকাতার প্লটে নির্মিত কলকাতার এই ছবিগুলোর গ্রহণযোগ্যতাই আমার দুর্ভাবনার হেতু।

১৮৭৯ সালে লেখা এবং মঞ্চস্থ হওয়া আ ডলস হাউজ[৪] নাটকের নোরা স্বামীর হাতের পুতুল হতে রাজি না হয়ে শিশুসন্তানদের রেখেই নিজের অস্তিত্বের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিলেন পৃথিবীর পথে। ২০১৫ সালে আরতির পক্ষে সম্ভব হলো না প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের সাহায্য নিয়ে হলেও স্বামী বিশ্বনাথকে ফিরিয়ে দেওয়া। 'স্ত্রীর পত্রে'[৫]র মৃণালের মতন স্বামীর বদলে জগদীশ্বরের পদতলে আশ্রয় নেওয়াও সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে, কারণ তাঁর কাছে পতিই পরমেশ্বর। লক্ষ্মীর পাঁচালির বাণী 'প্রতিদিন যেবা নারী স্বামীসেবা করে, অচলা হইয়া রই আমি তার ঘরে'কে জীবনের আপ্তবাক্য হিসেবে নিয়েছেন তিনি। 'রাগ অভিমান করলে কি সংসার করা যায়?'— এই রেটোরিক্যাল প্রশ্নের মাধ্যমে আরতি জানান তিনি কেন বিশ্বনাথের প্রতি কোনো অভিযোগ করেন নি অসুস্থ শিশু নিয়ে হিমশিম খাওয়া অবস্থায় স্বামী দিল্লী থেকে ফোন না করলেও, স্ত্রীর জন্মদিন ভুলে অন্য কোনো দম্পতির বিবাহবার্ষিকীর উপহার নিয়ে এলেও কোনোদিন কেন নিজেকে অবহেলিত ভাবেন নি। সংসারের দায়িত্ব কর্তব্য ছাড়া নারীর আর কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকতে নেই। প্রায় অর্ধশতাব্দী একসঙ্গে বাস করেও স্ত্রীর প্রিয় নায়ক কে, স্ত্রী দুপুরে ঘুমোন না বই পড়েন তা না জানাও স্বামীর জন্যে অস্বাভাবিক নয়, কেননা স্ত্রী আসলে আলাদা কোনো মানুষ নন, তিনি স্বামীর সেবা করার জন্য একটি অনুগত দাসী মাত্র।

[৪] A Doll's House, Henrik Ibsen 1879: http://www.penguin.com/static/pdf/teachersguides/DollshouseTG.pdf
[৫] 'স্ত্রীর পত্র', গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আবার সুদীপাকে দেখুন, নোরার মতন স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করে, পুনর্বিবাহ করেও একসময় তিনি মেনে নিতে বাধ্য হলেন আত্মসম্মান ধরে রাখার চেষ্টা তাঁর ভুল ছিল। মল্লিকার কাছে শিখে নিলেন কী করে পুরুষতান্ত্রিকতার সঙ্গে সমঝোতা করে একটি সুখী ও তৃপ্ত জীবন যাপন করা সম্ভব। এই উপলব্ধির সঙ্গে আজকের নারী যদি একাত্মতা অনুভব করেন তাহলে আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবন ভীষণরকম হুমকির মুখে পড়ে যাবে।

তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম যে আমাদের সমাজে বিবাহ কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নয়, এটি পুরুষতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং এই প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকেন পুরুষ আর নারী বরাবরের মতন থাকেন প্রান্তিক হয়ে। এটিই সামাজিক বাস্তবতা, ছবিগুলোতে এটাই দেখানো হয়েছে। তালাক ঠেকাতে হলে নারীকে অভিযোগহীন কর্তব্য পালন করে যেতে হবে আরতির মতন, কিংবা নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে দিয়ে স্বামীর 'বেটার হাফ' হয়ে বেঁচে থাকা শিখতে হবে মল্লিকার মতন। কেননা বিবাহ ব্যাপারটাই এমন শোষণমূলক।

প্রাচীন অনেক কাঠামোর অনেক রকম বিবর্তন হয়। বিবাহের প্রথাও সবসময় এক ধরনের ছিল না। একবিংশ শতাব্দীতে এসেও যদি বিবাহকে একটি শোষণমূলক ও পুরুষতান্ত্রিক প্রথা হিসেবে মেনে নেওয়ার প্রেসক্রিপশন দেওয়া হয় (বেলাশেষে), এর ব্যতিক্রম সম্ভব নয় এবং ব্যতিক্রম হলে অনুশোচনায় আক্রান্ত হয়ে বেদনার্ত হতে হবে নারীকেই (প্রাক্তন) এমন কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় এবং এই পশ্চাদপদ ধারণা সমাজে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে, এসব ছবি দর্শকপ্রিয়তা পায় ও প্রশংসিত হয় তাহলে বুঝতে হবে গোটা সমাজ পেছনের দিকে যাচ্ছে।

সুগারকোট শব্দটা ব্যবহার করেছিলাম একবার এর আগে। ছবি দুটোর শিরোনামে 'শাঁখা সিঁদুর' কিংবা 'স্বামী সংসার' জাতীয় শব্দ ব্যবহার করা হয় নি, কিছু সস্তা কমেডি থাকলেও মেলোড্রামাটিক নারী নির্যাতন নেই। কোনোমতেই আপনি এই ছবিগুলোকে মূলধারার ঢাকা বা কলকাতার ছবিগুলোর সঙ্গে এক কাতারে ফেলতে পারবেন না। স্টারকাস্ট আছে, কোরিওগ্রাফি আর সংগীতের ব্যবহারে রুচির স্পর্শ আছে, যা দর্শক টানার অন্যতম কারণ হতে পারে। কিন্তু বক্তব্যের দিক থেকে দুটো ছবিই পরিবেশন করছে পিতৃতান্ত্রিকতার বুলি, তুলে ধরছে পুরুষতান্ত্রিকতার ধ্বজা। যদি এই পুরুষতান্ত্রিক বক্তব্য আর পিতৃতন্ত্রের জয়গান চলচ্চিত্র দুটোর জনপ্রিয়তার মূল কারণ হয়, তাহলে আমি বলব অবস্থা আশঙ্কাজনক।

নতুন পেয়ালায় পুরাতন মদিরা পরিবেশন করে যে সুগারকোটেড ভিক্টোরীয় তেতো বড়ি গেলানো হচ্ছে, সানন্দে সেই বড়ি গেলা দর্শকদের নিয়ে আমি চিন্তিত, ছবির পরিচালকদের মানসিকতা কিংবা দক্ষতা নিয়ে নয়। হয়ত তাঁরা দর্শকের চাহিদা বুঝেই ছবি বানিয়েছেন, হয়ত তাঁরা জানেন সমাজ আসলে কতটা গোঁড়া আর রক্ষণশীল। ডিভোর্সকে নারীর জীবনের একটি ট্র্যাজেডি হিসেবে দেখাবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মসম্মানবোধকে নারীর জন্য নিষিদ্ধ বিষয় হিসেবে দেখিয়ে যদি তাঁরা ব্যবসা সফল হন, বিভিন্ন মহলের প্রশংসাও পান তবে তাঁরা তা নির্মাণ করবেন না কেন?

উম্মে ফারহানা শিক্ষক, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
ummefarhanamou@gmail.com